হিন্দুত্ব তথা ধর্ম ও তার বিকল্প - শশধর তর্কচূড়ামণি ফিরে এলেন

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

কিছুদিন ধরেই দেখা যাচ্ছে হিন্দুধর্মের মহিমা প্রচারের জন্যে কোনো কোনো প্রতিষ্ঠান নতুন উদ্যোগ নিয়েছেন। ব্যাপারটা অংশত ইসলামী মৌলবাদের প্রতিত্রি(য়া। এমনিতেই শতকরা ৯৫ ভাগ (বা তার চেয়েও বেশি) বাঙালি হিন্দু মধ্যবিত্ত ঘোর সাম্প্রদায়িক। তার ওপর এখন ধুনোর গন্ধ দিচ্ছেন নামকরা সব অধ্যাপক, সাহিত্যিক ইত্যাদি। জিনিসটা বেশ পাকিয়ে উঠেছে। তেমন কোনো প্রতিবাদও চোখে পড়ছে না।

মনে হতে পারে, এ আর নতুন কী ? হিন্দুত্ব নিয়ে বিভিন্ন ধর্মগোষ্ঠীর পত্র -পত্রিকায় কতই তো লেখালেখি হয়, এখনও হচ্ছে। ঠিকই। কিন্তু নব্য হিন্দুদের সঙ্গে তার একটা তফাত আছে। ঐসব জায়গায় যাঁরা লেখেন তাঁরা মূলত চাউর করেন নিজ গোষ্ঠী ও গু(র মাহাত্ম্য। বি(ে হিন্দু পরিষদের মাসিক পত্রিকা, বি(ে হিন্দুবার্ত্তা-য় রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে হিন্দুস্তানের কথা বলা হয়। এর যা কিছু 'আবেদন' তার সবই ভক্ত(, ধর্মভী(ও / বা সাম্প্রদায়িক লোকের কাছে। এ ধরণের লেখকরা বড় একটা তত্ত্বকথায় যান না, সাধারণভাবে ধর্মজীবনের উপযোগিতার কথা বলেন। অর্থাৎ পুরো ব্যাপারটা নিজেদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

হিন্দুত্বের নতুন প্রচারকরা এখন অন্যরূপে আবির্ভূত হয়েছেন। র(ণাত্মক ভাবভঙ্গি ছেনে রীতিমতো আত্র(মণাত্মক। ১৬ এপ্রিল ১৯৮৮ দেশ পত্রিকায় 'হিন্দুর ধর্ম' নিয়ে আটটা 'প্রচ্ছদ নিবন্ধ' ছাপা হয়েছিল। হিন্দুত্ব যে কত মহৎ এবং/ অথবা কত উদার এই নিয়ে বিস্তর 'যুক্তি(' ও 'প্রমাণ' হাজির করেছেন ছ জন পাঁড় হিন্দু। একজন মুসলমান ভদ্রলোক, হিন্দুধর্ম বলতে তিনি কী বোঝেন সেই নিয়ে এক প্রলাপ - নিবন্ধ লিখেছেন। দলছুট একমাত্র বিমল কর। তিনি সবিনয়ে জানিয়েছেন, ধর্মকর্মে তাঁর আগ্রহ নেই, 'হিন্দুধর্মের অন্তরে কী আছে আমি জানি না।' অনুপাতটা তাহলে ৬: (1+1)।

এই কায়দাটা অবশ্য দেশ-এর নিজস্ব। ২৫ এপ্রিল ১৯৮৭ - তে 'যত মত তত পথ' নিয়ে এরকম পাঁচটি 'প্রচ্ছদ নিবন্ধ' বেরিয়েছিল। সেখানে ইসলামি মৌলবাদ নিয়ে লেখা আছে, হিন্দু মৌলবাদের বিষয়ে কেউ রা কাড়েন নি। লেখকদের মধ্যে জন্মসূত্রে হিন্দু একজনই সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি জানিয়েছেন, কোনো ধর্মেই তাঁর আস্থা নেই, হিন্দুধর্মে তো নয়ই।

মুশকিল এইখানেই। কথাসাহিত্যিক হিসেবে বিমল কর ও সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় যথেষ্ট প্রতিষ্ঠিত (তাঁদের লেখার ভালো - মন্দর কথায় যাচ্ছি না), কিন্তু মননশীল বলে আদৌ পরিচিত নন! ধর্মকর্ম নিয়ে তাঁরা পড়াশুনো বা চিন্তাভাবনা করেন এমন প্রমাণও তাঁদের লেখায় পাওয়া গেল না। মোটামুটি নিজেদের বি(োস - অবি(োসের কথা বলতে পারলেও সে নিয়ে লড়ে যাওয়ার মতো তাকত তাঁদের নেই, এলেমও নেই। ফলে ধর্মের পাণ্ডারা কার্যত ফাঁকা মাঠেই গোল করেছেন। অথচ দেশ - এর কাজও হাসিল হচ্ছে। খুবই গণতন্ত্রসম্মতভাবে তাঁরা বি(দ্ধ মতও ছাপছেন।

* শশধর তর্কচূড়ামণি (১৮৫১-১৯৮২) ছিলেন উনিশ শতকের শেষের হিন্দু পুন(জ্জীবনবাদী আন্দোলনের অন্যতম প্রধান নেতা।

হিন্দু কট্টর, মোলায়েম ও পাঁকাল

'হিন্দুর ধর্ম' নিয়ে দেশ-এর ছ জন লেখক অবশ্য সব বিষয়েই একমত নন। জয়নারায়ণ সেন একেবারেই বেপরোয়া। জাতিভেদ মান্য (কারণ তা বেদসম্মত), বেদ কোনো মানুষের রচনা নয়, বেদ পুরাণ তন্ত্র ইতিহাসের প্রামাণ্য - এইসব উদ্ভট, অবাস্তব কথা বলতেও তিনি পেছপা নন। এ ভদ্রলোক কোনো 'উদারতা'র ধার ধারেন না। নানা বই থেকে দৃষ্টান্ত তুলে তিনি দেখিয়েছেন, চৈতন্য ও রামকৃষ(দিব্যি জাতিভেদ ছোঁয়াছুঁয়ি ইত্যাদি মেনে চলতেন। দয়ানন্দ আর রামমোহনেই তাঁর যা কিছু আপত্তি। এই ধরণের লোকদের আমরা এককতায় কট্টর হিন্দু বলতে পারি। কোনো বিষয়েই এঁদের আমতা - আমতা করার দরকার পড়ে না। যাবতীয় নীচতা ও হীনতাকেও এঁরা বুক ঠুকে সমর্থন করতে পারেন। চ(ু লজ্জারও বালাই নেই। 'লজ্জা ঘৃণা ভয় - তিন থাকতে নয়।'

অরিন্দম চত্র(বর্তী আবার শাস্ত্রবচন নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামান না। হিন্দু বলতে যে কয়েকশ (নাকি হাজারেরও বেশি?) গোষ্ঠী - উপগোষ্ঠী আছে, তাদের মধ্যে যে অবিরাম বিবাদ - বিতর্ক চলে তাতেও তিনি নিস্পৃহ। হিন্দুত্বকে তিনি দেখেন সাধারণ মানুষের আটপৌরে জীবনে -তীর্থে, তুলসী তলায়, ঠাকুরঘরে। অবশ্য জাতিভেদ নিয়ে তাঁর মনে কিঞ্চিৎ খুঁতখুঁতুনি আছে, 'আটপৌরে হিন্দুত্ব'র 'বিবিধ অসুবিধে' সম্বন্ধেও তিনি অচেতন নন। তবু সব বিভেদের উর্ধ্বে, হিন্দু আচার মেনে চলার মধ্যেই তিনি দেখতে পান হিন্দুত্বের গরিমা ও মহিমা, বি(ে হিন্দু পরিষদের নেতাদের মতো এ ভদ্রলোকও বেশ সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন - ইসলামি মৌলবাদীদের চিমটি কাটতে ছাড়ে না। কিন্তু হিন্দু মৌলবাদী - যেমন, বাল্যবিবাহের সমর্থক সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ বা সতীদাহে বি(োসী পুরীর শঙ্করাচার্য - ইত্যাদির বেলায় তুষ(ীভাব অবলম্বন করেন। অরিন্দমবাবুর মতো লোককে মোলায়েম হিন্দু বলা যায়।

এই দু-ধরণের বাইরেও আর - একদল হিন্দু আছেন। তাঁরা সা(াৎ পাঁকাল মাছ। কোনোরকমেই চেপে ধরতে পারবেন না, সুড়ুত করে পিছলে যাবেন। জাতিভেদ বা সতীদাহ নিয়ে কথা তুললে এঁরা সঙ্গে সঙ্গে বলবেন এগুলো ধর্ম নয়, পুরোহিততন্ত্রের কারচুপি। আসল হিন্দুধর্ম মানে ঈ(েরলাভ/ ব্রহ্মলাভ তুচ্ছ সামাজিক আচার দিয়ে তাকে বুঝতে যেও না। সাম্প্রদায়িকতার কথা উঠলে এঁরা হাঁহাঁ করে ওঠেন আরে রাম রাম, আমরা তো বলি 'যত মত তত পথ'। কিন্তু হিন্দুদের কোনো আচার - আচরণ এঁরা ছাড়বেন না, কোনো সামাজিক সংস্কারেও রাজি হবেন না। এঁদের পাঁকাল হিন্দু বলাই সমীচীন।

ধর্ম অবশ্যই বি(োসের ব্যাপার। সেখানে যুক্তি(- প্রমাণের স্থান গৌন। বি(োসটা বজায় রেখে, তার সমর্থনে ধার্মিকরা তর্ক ও তথ্যের আশ্রয় নেন। মনু বলেছিলেন, তর্ককে হতে হবে 'বেদের অবিরোধী'। পাঁচে পড়ে গেলেই আবার এসব লোক বলেন বি(োসে মিলায় বস্তু, তর্কে বহুদূর। সময় - বিশেষে এঁরা খুব উদার হয়ে যান, পরধর্মের নিন্দা করতে বারণ করেন। অন্তরে কিন্তু বি(োস করেন স্বধর্মে নিধন শ্রেয়, পরধর্ম ভয়াবহ।

তেঁতুলপাতায় কজন?

মজা এই যে, 'হিন্দু' শব্দটা ছাতার মতো - বৈদান্তিক থেকে জাত বৈষ(ব সবাই তার তলায় আছেন। জাত বৈষ(বরা জাতিভেদ মানেন না, বেদের মান্যতা নিয়ে আদৌ ভাবিত নন, জীবনের নানা অনুষ্ঠানে (বিয়ে, শ্রাদ্ধ ইত্যাদি) ব্রাহ্মণ্য আচার এড়িয়ে চলেন। অথচ নামত এঁরা হিন্দু। বর্ণাশ্রমী বৈষ(বের মেয়ে ঘটনাচত্রে(শাক্ত(বাড়িতে গিয়ে পড়লে ভোগান্তির একশেষ। একে তো মাছ - মাংস খাওয়া, তায় আবার পূজা - অর্চনার ব্যবস্থাও অন্যরকম। তবু শাক্ত(- বৈষ(ব দুজনেই হিন্দু। কেউ কেউ (যেমন হিতেশরঞ্জন সান্যাল) বেশ গদ্গদ হয়ে বলেন - এই হলো হিন্দুধর্ম কোনো বাঁধাবাঁধি কড়াকড়ি নেই। যার ইচ্ছে ভজনা করো, যেমন খুশি আচার মেনে চলো - তবু তুমি হিন্দু। অর্থাৎ, যে নিজেকে হিন্দু বলে সে-ই হিন্দু। এটা এক বৃহৎ তঞ্চকতার আশ্রয়। পাঁকাল হিন্দুরা এর সুযোগেই খেলে চলেন। কখনও গলা তুলে বলেন, বেদ - উপনিষদ্ ইত্যাদির মহান চিন্তাধারাই হিন্দুত্বের ভিত্তি (হিতেশরঞ্জনবাবুর ভাষায়, মার্গ সংস্কৃতি'), কখনও বা সরল বি(োসী মানুষকে (যিনি জীবনে বেদ - উপনিষদের পাতা ওল্টান নি কিন্তু ট্রামে - বাসে যেতে যেতে ঠনঠনে বা বৌবাজারে কপালে হাত ঠেকান) দেখিয়ে বলেন - এই হলো হিন্দু।

তঞ্চকতা এইখানেই। হিন্দুত্বের কোনো নির্দিষ্ট ভিত্তি নেই। তার মধ্যে এক - এক ধর্মগোষ্ঠীর এক - এক 'পবিত্র গ্রন্থ' আছে, হিন্দুর কোনো সাধারণ ধর্মগ্রন্থ নেই। একের কাছে যা 'ক্যানন', স্বীকৃত, অন্যের কাছে তা 'অ্যাপত্রি(ফা', অস্বীকৃত। বেদই হিন্দুত্বের একমাত্র উৎস - এটা বাজে কথা। অনন্তলাল ঠাকুর তাই তন্ত্রকেও স্বীকার করেন, কারণ 'বেদের মত তন্ত্রও অপৌ(ষেয়। তন্ত্র বেদবিরোধী নহে।' অন্যদিকে শিবজীবন ভট্টাচার্য বেদ ও তন্ত্রের পার্থক্যের ওপরেই জোর দেন। তিনি বলেন

...হিন্দুধর্মকে বেদমূলক ধর্ম বলে নিরূপণ করা নির্দোষ নয়, কারণ হিন্দুধর্মের দ্বিতীয় উৎস হল তন্ত্র। বর্তমানে লোকায়ত হিন্দুধর্মের এক ল(্য নানা মূর্তিপূজার দার্শনিক ভিত্তি তন্ত্রেই পাওয়া যায়। বেদে নানা দেবতার পূর্ণ বিবরণ আছে, তার থেকে দেবতার মূর্তি অঙ্কন অথবা গঠন খুবই সহজ। কিন্তু তবু বেদে প্রতিমা পূজার কোনো প্রমাণ নেই। দ্বিতীয়ত, বর্তমানে মঠ মিশনের সাধু বা অন্যান্য মহাত্মাদের কাছ থেকে দী(া নেওয়ার হিড়িক হিন্দুধর্মে তন্ত্রের প্রভাবই স্পষ্ট করে।

জয়নারায়ণ সেনও বেদের পাশাপাশি তন্ত্রের প্রামাণ্য স্বীকার করেন, কিন্তু বেদে মূর্তিপূজা নেই -একথা মানতে রাজি নন। তাঁর মতে বেদের একাধিক জায়গায় 'মূর্তিপূজা বিহিত হয়েছে'! অরিন্দম চক্র(বর্তী আবার পূজা পদ্ধতির ঐক্য দিয়েই সাকার - নিরাকার মিলিয়ে দেন। কোনো 'ক্রীড' না থাকাটাই হিন্দুত্বের পরাকাষ্ঠা!

'ক্রীড' না থাকার বাস্তবিকই অনেক সুবিধে আছে। ধ(ন, শিবজীবনবাবু অতি উদার হিন্দুত্বে বি(্বাসী, তাই জন্মান্তর, জাতিস্মর ইত্যাদি বিবিধ বুজ(কিতেও আস্থাবান্। হিতেশরঞ্জনবাবু এগুলোর নৃতাত্ত্বিক উৎস জানেন, তাই আর্যামির বড়াই করেন না, জাতিগত অত্যাচারকেও অস্বীকার করেন না - তবুও মনে করেন, হিন্দুধর্ম বল্লে একটা 'সামান্য ধর্ম' আছে!

এই মুক্ত(ধর্মের সপ(আরও একটা যুক্তি(প্রায়ই শোনা যায়। অজস্র গোষ্ঠী ও উপগোষ্ঠী থাকা সত্ত্বেও 'ক্রীড' - বিহীন হিন্দুত্ব হাজার হাজার বছর টিকে আছে - এ-ই নাকি তার শক্তি(র দিক। চমৎকার লিখেছেন অরিন্দমবাবু হিন্দুধর্মের মধ্যে এত বিভেদ, তার বি(দ্ধে এত প্রচার, তবু 'নি(দ্বেগ পাকা তাস খেলুড়ের মত হিন্দু বলছে ''আছি''।' সবিনয় নিবেদন শুধু কি হিন্দুই আছেন'? ইহুদিরাও তো শত অত্যাচার সয়েও আছেন। খ্রিস্টানদের বয়সও প্রায় দুহাজার বছর। বৌদ্ধরা তার চেয়েও প্রায় পাঁচশ বছরের বড়। ঐতিহাসিক নিয়মেই এই প্রত্যেকটি ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে নানা ভাগ - উপভাগ আছে। সবার মধ্যেই কট্টর ও মোলায়েম দুটি বড় দল দেখা যায়। কিন্তু পাঁকাল হিন্দুর মতো তাঁরা কেউ মৌলবাদ ও সংস্কারবাদের মধ্যে জল - কুমীর খেলেন না। সম্প্রতি সোভিয়েত দেশে গিয়ে স্বামী লোকে(্বরানন্দ খুব অবাক হয়ে গিয়েছিলেন 'খৃস্টান সম্প্রদায় যে এত শাখা - প্রশাখায় বিভক্ত(, তা আমার ধারণা ছিল না' (রবিবাসরীয় আনন্দবাজার পত্রিকা, ৭ অগস্ট ১৯৮৮)। আজ্ঞে হ্যাঁ। ভাগাভাগিটা হিন্দুর একচেটিয়া নয়। তা সত্ত্বেও যে - কোনো খ্রিস্টভক্ত(ই নিজেকে খ্রিস্টান বলতে পারেন। তাঁদেরও একটা 'সামান্য ধর্ম' আছে। সারা দ(িণপূর্ব এশিয়ায় বৌদ্ধদেরও বহু রূপ। এ বাবদে হিন্দুর কোনো মৌলিকতা নেই। প্রত্যেকটি বি(্বধর্মই 'তেঁতুলপাতা'। আর কারও খবর না রাখলে হিন্দুধর্মের 'বহুত্বের মধ্যে ঐক্য' নিয়ে বড়াই করা যায়। একটু নয়ন মেলে চারধার দেখলে আর সে-কথা বলা যায় না।

গরমিলে মিলাইয়া...

আদর্শ হিন্দুধর্মের অধোগতির জন্য পুরোহিততন্ত্রকে দায়ী করাটাও বেশ পাঁকাল কায়দা। দেশ -এ১৬ এপ্রিল ১৯৮৮ সংখ্যায় সম্পাদকীয়তে এই রকমই লেখা হয়েছে

এই হল আচারের দিক। যে দিকে আর কোনও প্র(্ন নেই। সেই দিকেই এলেন পুরোহিত সম্প্রদায়। অন্বেষণের পথরোধ করে তাঁরা প্রথাটাকেই বড় করে তুললেন। গড়ে তুললেন অন্ধবি(্বাস। যে বি(্বাসের আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে দেওয়া হল কুসংস্কারের বাঁধন। তৈরি হল শাস্ত্র। তার ব্যবহার হতে লাগল শস্ত্রের মতো। আর এই শস্ত্রটিকেই মনে হতে লাগল ধর্ম। ...পুরোহিতদের হাতে পড়ে ধর্মের অনুষঙ্গ কৃচ্ছ্রসাধন হয়ে দাঁড়াল নিপীড়নের আনন্দ। ধর্মের দর্শন অংশটি চাপা পড়ে গেল। পণ্ডিতদের পাণ্ডিত্য কূটতর্কের পথ ধরল। স্মৃতি, শ্রুতি, ন্যায়, দর্শন পুষ্ট হল। হিন্দুধর্ম পেল শ্রদ্ধেয় নৈয়ায়িক, (তর্কচঞ্চু)!! স্মার্তপণ্ডিত। হারিয়ে গেলেন তপোবনের ঋষি।

জয়নারায়ণ সেন বা বিমলকৃষ(মতিলাল এসব কথা কী করে হজম করবেন কে জানে! সাগরময় ঘোষ (বা যিনি এই সম্পাদকীয়টি লিখেছেন) ঠিক কী করতে চাইছেন? স্মৃতি তাহলে হিন্দুধর্মের কেউ নয়? ভদ্রলোক 'শ্রুতি' কথাটার মানে জানেন তো? এর পরেই তিনি প্রায় এক নি(্বাসেই বলেন, 'সত্যকে জানাই ছিল হিন্দুর ধর্ম। বুদ্ধের হৃদয়, শ্রীচৈতন্যের প্রেম, শঙ্করের মেধা যুক্ত(হলে যে মানব সেই মানবের ধর্মই হল হিন্দু। হিন্দুধর্ম বেদমুখী। হিন্দু সম্পর্ক সরাসরি স্রষ্টার সঙ্গে। মাঝখানে কোন প্রতিনিধি নেই।' ইত্যাদি ইত্যাদি

এক জায়গায় এত ভুল থাকলে কোন্টা ছেড়ে কোন্টা ধরব? হিন্দুধর্ম যদি 'বেদমুখী' হয়, তবে যজ্ঞই তার প্রধান কর্তব্য। পুরোহিত ছাড়া যজ্ঞ হয় না। বিভিন্ন ধরণের যজ্ঞের জন্যে চার থেকে ষোলোজন পুরোহিত লাগে। শ্রৌতসূত্রে তার নির্দেশ দেওয়া আছে। কোন্ পুরোহিত কী দ(িণা পাবেন তা - ও ঠিক করে দেওয়া হয়েছে। পুরোহিত বাদ দিয়ে স্মৃতি - পুরাণোক্ত(ধর্মের আচারও অসম্ভব। ব্রাহ্মণ জাতির তাহলে অন্ন মানা যাবে। উপনয়ন, বিবাহ বা শ্রাদ্ধ পুরোহিত ছাড়া করাই যাবে না। তাঁদের 'হাতে পড়ে' যদি ধর্মের দুরবস্থা দেখা দিয়ে থাকে তার জন্যে শ্রৌতসূত্রকাররাই দায়ী। 'মাঝখানে প্রতিনিধি'র ব্যবস্থা তাঁরাই করে দিয়ে গেছেন।

যাগ-যজ্ঞ ও লোকচলতি ধর্মীয় কুসংস্কারের বি(দ্ধে খে দাঁড়িয়েছিলেন গৌতম বুদ্ধ। ধর্মতত্ত্বের দিক দিয়ে তাঁকে কিন্তু কোনোভাবেই হিন্দুধর্মের আওতায় আনা যায় না। দশ - অবতারের মধ্যে তাঁকে অবতার করে রাখাটা সুবিধাবাদের সামিল। লোককে বলা যায়, 'দ্যাখো, আমরা কত ভালো। যে - বুদ্ধ আমাদের ভুট্টিনাশ করেছেন তাঁকেও আমরা অবতার বলে মেনে নিয়েছি।' কিন্তু বুদ্ধবচনের মধ্যে যা কিছু ইতিবাচক তার সবকিছু বাদ দিয়ে কোন্ বুদ্ধকে স্বীকার করা হলো? জয়দেবের দশাবতার - স্তোত্রে বুদ্ধকে মানেকা গান্ধীর প্রথম সংস্করণ করে রাখা হয়েছে। তিনি একজন অদর্শ পশু - প্রেমিক, যজ্ঞে পশুবধ দেখে তাঁর হৃদয় ব্যথিত হয়েছিল! হিন্দুধর্মের সঙ্গে বুদ্ধের যেন আর কোনো বিরোধ নেই! এই কি বুদ্ধের ধর্ম ও সঙ্ঘের স্বরূপ? কোথায় গেল হিন্দুর সৎ-চিৎ -আনন্দের বিপরীত তত্ত্ব - অনী(্বরত্ব, অনাত্ম্য, ও দুঃখের ভাবভূমি?

শঙ্করাচার্যও অবশ্য যজ্ঞের কিছুমাত্র ধার ধারতেন না। সাদা - সাপটা বলেই দিয়েছিলেন, জ্ঞান আর কর্ম (যজ্ঞ)-র ব্যবধান পর্বতের মতোই অকম্প্য, অর্থাৎ কিছুতেই মেলবার নয়। আর চৈতন্যের কথা বলাই বাহুল্য। জ্ঞান ও কর্ম - দু - এর পথ ছেড়ে তিনি আশ্রয় করেছিলেন ভক্তি(কে। তাঁর অনুগামীরাও পরিষ্কার দুটি ভাগে ভাগ হয়ে আছেন। ব্রাহ্মণ্য আচারের সঙ্গে আপসরফা করে একদল দিব্যি পৈতে বুলিয়ে গু(গিরি করেন। আর - এক দল - আউল, বাউল ইত্যাদি ছোটো - বড় অনেক উপদলের সমষ্টি ও বৈদিক আচরের ঘোর বিরোধী। (সম্প্রতি সুধীর চক্রবর্তী এঁদের কথা সবিস্তারে লিখেছেন)।

ইচ্ছে করলেই যদি বুদ্ধ - শঙ্কর - চৈতন্যকে মেলানো যেত তাহলে পৃথিবী অনেক সুখের জায়গা হতো, সন্দেহ নেই। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তা হওয়ার নয়। একদম কিচ্ছু না জানলে তবে এ-তিনের মধুর মিলনের কথা ভাবা যায়

মহামায়ার মায়ার ভুলে

প্র(্নটা শুধু হিন্দু ধর্ম নিয়ে নয়, যে - কোনো ধর্ম নিয়েই। মানুষকে কি কোনো - একটা ধর্ম মানতেই হবে? 'যত মত তত পথ' -এর পথিকরা বলেন -যা হোক একটা ধর্ম মেনে চলো, সে গাছ - পাথর অর্চনাই হোক, ছেনি - হাতুড়ি পুজোই হোক। এক বা বহু দেব - দেবী, সাকার বা নিরাকার ঈ(্বর, আল্লা, গড, ব্রহ্ম - কিছু একটা আশ্রয় থাকলেই হলো। এমন কিছুতে বি(্বাস করা চাই -ই, যা মানুষের চেয়ে বড়, প্রকৃতির চেয়ে বড়, মানুষের কল্পনায় যতটা শুভ ধরা পড়ে তার চেয়ে শুভ। আচার - অনুষ্ঠান জপ - তপ - ধ্যান - যোগ এসব বাহ্য আচার মাত্র, আসল কথা সেই অসীম শক্তি(র চেতনা। সব ধর্মের এই হলো সারকথা।

কথাগুলো বেশ শ্রুতিরোচক, উদারও বটে। কিন্তু আসল প্র(্ন আরও গোড়ায়। আদৌ একটা অপ্রাকৃত বা অতিপ্রাকৃত সত্তায় বি(্বাস করতে হবে কেন? কেন আঁকড়ে থাকতে হবে এক প্রাচীন উৎকল্পনাকে? এর কি কোনো বিকল্পই নেই? একথা ঠিক যে, প্রকৃতির কাছে মানুষ এখনও অসহায়। নিত্যকার রোগভোগ থেকে বণ্যা

ভূমিকম্প পর্যন্ত অনেক কিছুকেই আমরা এখনও বশে আনতে পারি নি। গত দুশ বছরে জানার সীমানা ানেক বাড়লেও অজানার দিগন্ত দূরেই রয়ে গেছে। সৃষ্টি - স্থিতির সব রহস্য বোঝার মতো (মতা আমাদের এখনও হয়নি।

কিন্তু কোনো ধর্মের (এককভাবে বা মিলিতভাবে) কি সে (মতা আছে? সৃষ্টি - স্থিতি নিয়ে তবে একই ধর্মের মধ্যে এত মত কেন? সব কথা জানি না বলে এক বা বহু দেবতা বা পরব্রহ্মের কল্পনা করতে হবে কেন? কেন সত্যি বলতে হবে পরস্পরবিরোধী সব মতকে? 'যত মত তত পথ' কথাটা শুধু ভুল নয়, (তিকর। সত্য - নির্ধারণের মনোভাবটাই এতে নষ্ট হয়ে যায়। এখনও পর্যন্ত আমরা যেটুকু জেনেছি তার একমাত্র অবলম্বন - বি(্বাস নয়, তথ্য আর যুক্তি(। ইন্দ্রিয়ের সীমা ছাড়িয়ে আমাদের জ্ঞানের উৎস বিস্তৃত হয়েছে বিচিত্র মাধ্যমে - যেমন, দূরবী(ণ যন্ত্র পেরিয়ে বেতার-তরঙ্গে। এর প্রত্যেক স্তরেই বুদ্ধি ও (মতাকে বারে-বারে শান দিতে হয়েছে। 'ঈ(্বরের লীলা' বলে হাত-পা ছেড়ে বসে থাকলে কিছুই হতো না। ঈ(্বর, আল্লা কেউ আমাদের পেনিসিলিন জোগান নি। বরং যতদিন 'তাঁর' ওপর ভরসা করে মানুষ বসে থেকেছে, তার আয়ু হয়েছে ীণ থেকে ীণতর। এইসব প্রমাণ থেকেই আমরা মনে করি যে-পথ ধরে মানুষ এতটা এগিয়েছে, সেই পথই একমাত্র পথ। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির কোনো বিকল্প নেই।

অবশ্যই তিরিশের দশকে একথা যত সহজে বলা যেত, এখন তা বলা যায় না। শাসকশ্রেণীর স্বার্থে বিজ্ঞানের অপব্যবহার, তার মারণ(মতার বিস্তার - এসব ঘটনা এখন আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ধর্মের জায়গায় বিজ্ঞানকে বসিয়ে দিলুম, সঙ্গে সঙ্গে সব ঠিক হয়ে গেল - এও এক অতিসরল বি(্বাস, ধর্মবি(্বাসের মতোই অযৌক্তি(ক। সমাজ এবং ব্যক্তি(মানুষ - দু -এরই পরিবর্তন চাই। তবে বিজ্ঞান তার ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে পারবে।

ধর্ম ও সুনীতি

ধর্মের সপ(এতকাল এটাই ছিল বড় যুক্তি(। স্বর্গ - নরক পাপ - পুণ্য ইত্যাদির ভরসা বা ভয় না থাকলে সমাজে সুনীতি - দুর্নীতির ভেদ থাকবে না। শুধু আইনের ভয় দেখিয়ে সমাজ র(া করা যায় না। তার জন্যে চাই আরও শক্ত(খুঁটি। একমাত্র ধর্মই সে - জায়গা নিতে পারে।

গত কয়েক হাজার বছরের ইতিহাসে কিন্তু একথার কোনো নির্বিকল্প প্রমাণ পাওয়া যায় না। সব সমাজেই সুনীতি ও দুর্নীতিপরায়ণ লোক ছিলেন ও আছেন। ধর্মপ্রাণ লোকও জীবনের অন্য(ত্রে জাল জোচ্চুরি ঠকবাজি করতে পারেন। বঙ্কিম এক জমিদারের কথা বলেছিলেন

> তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ এবং অত্যন্ত হিন্দু। ...আমরা জানি যে, এক ব্যক্তি(র পূজা আহি(ক, ত্রি(য়াকর্মে, দেবতা ব্রাহ্মণে আন্তরিক ভক্তি(, সেখানে কপটতা কিছু নাই। জাল করিতে করিতেও হরিনাম করিয়া থাকেন। মনে করেন, এ সময় হরি - স্মরণ করিলে এ জাল করা আমার অবশ্য সার্থক হইবে। (''হিন্দুধর্ম'', দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম)

এর পাশাপাশি এমন পাকা নাস্তিক, নিরী(্বরবাদীও থাকেন যিনি কোনো অন্যায় - অসত্যের ধার দিয়ে যান না। আবার এর বিপরীত নিদর্শন ও দুদিকেই পাওয়া যাবে। ধার্মিক লোক সমাজ-জীবনে সৎ বা অসৎ দুই-ই হতে পারেন, নইলে অসদ্‌গু(র কথা উঠবে কেন? তেমনি অ-ধার্মিক লোককেও সৎ বা অসৎ দুই-ই হতে দেখা যায় ধার্মিক রবীন্দ্রনাথও তাই চতুরঙ্গ উপন্যাসে নাস্তিক জ্যাঠামশাইকে আদ্যোপান্ত খাঁটি মানুষ হিসেবে উপস্থিত করতে দ্বিধা করেন নি। ধর্ম ও সুনীতির সমীকরণটা ঈ(্বর বা পরমাত্মার মতোই উৎকাল্পনিক।

ধর্মের বিকল্প

সব বোঝার পরেও কিছু মানুষের মনে ধর্মের জন্যে একটা ছোটো বা বড় জায়গা থেকে যায়। কারও কাছে হয়তো সেটা বিরাট্‌ত্বের, রোলাঁ ও ফ্রয়েড যাকে বলেছিলেন ওসিআনিক ফিলিং। তার কারণটা দুর্জ্ঞেয়, কিন্তু অজ্ঞেয় নয়। দৈনন্দিন জীবনের (দ্রতা এড়িয়ে বাঁচতে চাইলে ব্যক্তি(মানুষ একটা আশ্রয় চাইবেন। কিন্তু সে বিরাট্‌ত্বের ধারণা অনেকটাই মিস্টিক ধাঁচের। কোনো বিশেষ ধর্মের অবলম্বন তার লাগে না। এটা একান্তই ব্যক্তি(গত বি(্বাসের ব্যাপার। 'তথ্য', 'যুক্তি(' বা 'প্রমাণ' দিয়ে তার ব্যাখ্যাও কেউ দেন না, অনুভবের কথাই বলেন। সে নিয়ে দল বাঁধা যায় না।

কিন্তু ধর্ম সম্পর্কে সামাজিক মানুষের যে তথাকথিত স্বাভাবিক ভক্তি(- তার কারণটা ভেতরের নয়, বাইরের। পরিবার-পরিবেশে ধর্ম ও তার সঙ্গে যুক্ত(আচার-অনুষ্ঠান হামেহাল হাজির রয়েছে। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত দশকর্মে তার বিস্তার। পথে পথে ছড়িয়ে আছে দেবস্থান - মন্দির মসজিদ গির্জা ইত্যাদি। সব মিলিয়ে এই কল্পনার জিনিসটা তার কাছে তাই (ুধা-তৃষ(ার মতোই বাস্তব। অন্য দিকে, ধর্মকে বাদ দিয়ে যুক্তি(বুদ্ধি ও আত্মশক্তি(র প্রায় কোনো প্রচারই নেই। প্রচার আছে ভোগবাদের। আরও ভালো খাবার, আরও ভালো কাপড়, আরও ভালো বাড়ি - এই চিন্তাহীন ভোগলালসায় ত্র(মাগত ইন্ধন জোগায় পুঁজিবাদী সমাজ ও গণ - মাধ্যম। ধর্মের বিরোধিতা করলেই লোকে ভাবে - এরা বুঝি শুধু ইহসুখবাদের কথা বলছে। হিন্দুধর্মের পাণ্ডারা এইভাবেই হাজির করেছেন চার্বাককে।

এই ধারণার প্রতিবাদে আমরা বলতে চাই বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি মানে প্রয়োজনের অতিরিক্ত(ভোগ নয়। আবার জৈব প্রয়োজনকে অস্বীকার করাও নয়। বিচার করে দেখতে হয় - কার কতটা প্রয়োজন। সমষ্টির প্রয়োজনে ত্যাগস্বীকারও করতে হবে। এই নৈতিকতার ভিত্তি মানুষ ও তার সমাজ। স্বর্গ বা মুক্তি(র লোভে নয়, সমূহ মানুষের উন্নতির ভাবনাই তার পাপ-পুণ্য ঠিক করে দেবে। কোনো গু(র কথায় - তিনি যত ভালো লোকই হোন - ওঠ-বোস করাটা অনুচিত। নিজের বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতায় মানুষকে তার পত দেখাবে। তাতে ভুল হতে পারে। হোক। অন্ধ বি(্বাসের চেয়ে ভ্রান্ত বুদ্ধি ভালো।

আমরা জানি, ইচ্ছে করলেই পৃথিবী থেকে ধর্মের উচ্ছেদ করা যায় না। হাজার হাজার বছর ধরে মানুষের আবেগ তাকে আশ্রয় করে আছে। পুত্রশোক বা দুরারোগ্য ব্যাধির সামনে শুধুই যুক্তি(বুদ্ধির কথা বলে লাভ কী? আর গরিব মানুষের তো ভগবান ছাড়া কেউ নেই। কে জোগাবে ভাত - কাপড়, কে সারাবে রোগ? তাঁর সামনে দুটো পথ খোলা থাকে। এক, পূর্বজন্মের পাপ বা 'ভগবান্ যা করে মঙ্গলের জন্যে করেন' এই মেনে নিয়ে সান্ত্বনা পাওয়া দুই, সমস্যার মূলে যাওয়া, সেগুলো যাতে উপড়ে ফেলা যায় তার ব্যবস্থা করা। এর জন্যে বিদ্রোহ করার মতো সাহস লাগে। যতদিন বাস্তব জীবনের বড় সমস্যাগুলো মেটানো না যাচ্ছে ততদিন ধর্ম নিয়ে বেফিকির (কিন্তু বেফায়দা) চিন্তা - ভাবনা আর নির্লজ্জ ব্যবসা - দুই -ই চলবে। বড়লোকের কাছে তা হবে পাপ(ালনের উপায়, গরিবের কাছে শেষ আশ্রয়। কিন্তু কুটো ধরে যেমন ডুবন্ত মানুষ বাঁচে না, ধর্মও মানুষকে বাঁচাতে পারবে না। যুক্তি(বুদ্ধি আর আত্মশক্তি(ই তাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে সুস্থ জীবনের দিকে। কিন্তু তার সপ(প্রচার কই?

শ্রীরামের এ কী হাল অবতার থেকে রাষ্ট্রপু(ষ!

চাই রাষ্ট্রপু(ষ

হালে একটা কথা চালু করার চেষ্টা হচ্ছে শ্রীরামচন্দ্রকে সব ভারতবাসীরই রাষ্ট্রপু(ষ (জাতীয় নেতা) বলে মেনে নেওয়া উচিত। এক সিন্দী নেতা এই সেদিন ময়দানে সভা করে বলে গেলেন, 'ইন্দোনেশিয়ার মুসলিমরা যদি রামায়ণকে শ্রদ্ধা করতে পারেন তাহলে ভারতের মুসলিমদের বাধা কোথায়?' স্বস্তিকা বলে একটি ট্যাবলয়েড-এ বেশ হেঁকে প্র(্ন তোলা হয়েছে 'এবং শ্রীরামচন্দ্রকে যদি এ দেশের জাতীয় নেতা না বলা হয় তবে কাকে বলা হবে?'

ভারতীয় কোনো ঐতিহাসিক চরিত্রকে রাষ্ট্রপু(ষ খাড়া করা যাচ্ছে না - সেই দ্বাপর যুগের পর এমন বিশাল শূন্যতা - ভাবতেও কেমন যেন লাগে। আদৌ রাষ্ট্রপু(ষ লাগবে কেন - এটাই অবশ্য প্রথম প্র(। ধরা যাক, তার দরকার আছে। তাহলেও একটা কথা থাকে। রাষ্ট্রপু(ষ হিসেবে কাউকে চালাতে গেলে তংার তো কিঞ্চিৎ সর্বভারতীয় মহিমা থাকা দরকার। শ্রীরামচন্দ্র-র কি তা আছে? সারা ভারতের সব প্রান্তের কথা বলতে পারব না। তবে মনে হয় উত্তর ভারতের চেয়ে দা(ণাত্যে তাঁর প্রভাব অনেক কম। আমরা তো থাকি ভারতের এক কোণে, পাশুববর্জিত দেশে। তার কথাই ধরা যাক।

বাঙালির রাম-অভক্তি(

বাঙলা আমাদের ভাষা। তার একটা বড় বেচাল দিক হলো প্রয়োগে রাম - নামের কোনো মহিমা নেই। বহুদিন আগেই রবীন্দ্রনাথ ল(্য করেছিলেন

> 'হাঁদারাম' 'ভোদারাম' 'বোকারাম' 'ভ্যাবাগঙ্গারাম' শব্দগুলোর ব্যবহার চূড়ান্ত মূঢ়তা প্রকাশের জন্যে। কিন্তু 'সুবুদ্ধিরাম' 'সুপটুরাম' বলবার প্রয়োজন ভাষা অনুভব করে না। সবচেয়ে অদ্ভুত এই যে 'রাম' শব্দের সঙ্গেই যত বোকা বিশেষণের যোগ, 'বোকা লক্ষ্মণ' বলতে কারও চিই হয় না।' (বাংলা ভাষা পরিচয়, বি(ভারতী, ১৩৫৬, পৃ। ৯৬)

প্রবাদেও একই ব্যাপার। শ্রেণীবাচক কর্তৃপদে তির্যকরূপে দৃষ্টান্ত প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,

> যখন বলি 'রামে মারলে মরব, রাবণে মারলেও মরব', তখন ব্যক্তি(গত রামরাবণের কথা বলি নে(তখন রামশ্রেণীয় আঘাতকারী ও রাবণশ্রেণীর আঘাতকারীর কথা বলা হয়। (ঐ পৃষ্ঠা ১০০)

আমাদের অবস্থা মারীচের মতো রামের হাতে মরলে অ(য় স্বর্গলাভ হবে - এটা কিছুতেই ভাবতে পারি না।

আধুনিক বাঙলা বাঙলা সাহিত্যও সেই ধারাই বজায় রেখেছে। কৃত্তিবাস ওঝা ইত্যাদি যা করেছিলেন - করেছিলেন। তারপর সুকুমার রায়, রাজশেখর বসু, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য ইত্যাদি রামকথার হদ্দমুদ্দ করে গেছেন। ''লক্ষ্মণের শক্তি(শেল'', ''হনুমানের স্বপ্ন'', 'উলট পুরাণ'' - এ সবই অতি উচ্চাঙ্গের রসিকতা। ফলে রামমাহাত্ম্য সর্বদাই চোট খেয়েছে। সে নিয়ে কেউ বি(াভ দেখায় নি। মেরেছিল ফ্রান্সের রাজা সপ্তম শার্ল অবশ্য ঐ রায় বাতিল করানোর জন্যে দুবার চেষ্টা করেছিলেন - কোনো সৎ, মানবিক উদ্দেশ্যে নয়, নেহাতই নিজের অবস্থা পোক্ত(করার জন্যে। তাতেও কোনো ফল হয় নি। পরে পোপ তৃতীয় কাল্লিসক্তস একটি কমিশন বসান। ১৪৫৬-য় তাঁরা জানালেন জোন -এর বি(দ্ধে আনা অভিযোগগুলো জালিয়াতি ও ছলচাতুরী করে আদায় করা তখন জোন 'পুনর্বাসিত' হলেন।

একেই বলে গ(মেরে জুতোদান।

গল্পটা কিন্তু এখানেই শেষ হয় নি। জোন - কে পুড়িয়ে মারার প্রায় পাঁচশ বছর বাদে, ১৯০৪ -এ ভাটিকান থেকে তাঁকে ভেনেরেব্‌ল্ (মাননীয়া) বলে ঘোষণা করা হলো। ১৯০৮-এ তিনি হলেন ব্লেসেড (আশীর্বাদধন্যা)। তার ক বছর পরে, ১৯২০ -তে জোন হয়ে গেলেন পুরোদস্তুর সেন্ট - সন্ত জোন! (১৯২৩ -এ এই নামে একটি অসাধারণ নাটক লিখেছিলেন জর্জ বার্নাড শ)।

আমরা অপে(া করে আছি বিজ্ঞানী গালিলেওকে কবে 'সন্ত গালিলেও' বলে ঘোষণা করা হবে।

> পোপ দ্বিতীয় জন বলেছেন, এই পুনর্বাসনকে 'বিজ্ঞান ও ধর্মবি(্বাসের মহান্ পুনর্মিলন' বলে দেখা হচ্ছে। কিন্তু, হে প্রাজ্ঞ মহামান্য, সে তো হওয়ার নয়! সত্য আর মায়ার চিরশান্তিপূর্ণ সহাবস্থান অসম্ভব।

এই প্রসঙ্গে একটা ঘটনা মনে পড়ে গেল। ১৯৮১ - তে ভাটিকান - এর আমন্ত্রণে এ-যুগের বিস্ময়বিজ্ঞানী স্টিফেন ডবলিউ. হকিং একটি সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন। ব্রহ্মাণ্ডতত্ত্ব (কসমোলজি) বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে কিছু পরামর্শ নিতে চেয়েছিলেন - ক্যাথলিক ধর্মমণ্ডলী সম্মেলনের শেষে বিজ্ঞানীরা পোপ দ্বিতীয় জন পল - এর দর্শন লাভের অনুমতি পান। পোপ তাঁদের বলেন মহাবিস্ফোরণ (বিগ ব্যাং) -এর পরে মহাবি(্বের বিবর্তন নিয়ে চর্চা করায় কোনো আপত্তি নেই! কিন্তু খোদ মহাবিস্ফোরণ (বিগ ব্যাং)- নিয়ে অনুসন্ধান করাটা বিজ্ঞানীদের প(উচিত হবে না, কারণ সেটি হলো জগৎসৃষ্টির মূহূর্ত, সুতরাং ঈ(রের কীর্তি। হকিং লিখেছেন

> আমি তখন খুশি হয়েছিলুম যে তিনি (=পোপ) জানতেন না ঐ সম্মেলনে ঠিক তার আগেই আমার বক্তৃ(তার বিষয় কী ছিল - দেশ-কাল সীমাবদ্ধ কিন্তু তার কোনো বেড়া নেই। অর্থাৎ তার কোনো শু(নেই, জগৎসৃষ্টির্য কোনো মুহূর্ত নেই। গালিলেও-র নিয়তির ভাগী হওয়ার কোনো বাসনা আমার ছিল না, তাঁর সঙ্গে আমি খুবই একাত্ম বোধ করি। অংশত তার কারণ এই যে, ঘটনাচক্রে(তাঁর মৃত্যুর ঠিক তিনশ বছর পরে আমার জন্ম।
>
> (অ ব্রিফ হিস্ট্রি অফ টাইম, ড়িউ ইয়র্ক ব্যান্টাম বুক্স, ১৯৮৮, পৃ. ১২২)

ক্যাথলিক ধর্মমণ্ডলী যদি সসম্মানে গালিলেও-র পূর্ণ পুনর্বাসনও করেন, মহাবিস্ফোরণের পাঁচ থেকে তাঁরা বেরোবেন কী করে? হকিং ও তাঁর সহকর্মীরা ঘোর নাস্তিক। তাঁদের চুলের ডগা ছোঁয়ার (মতা কোনো ধর্মপ্রতিষ্ঠানের নেই। সৃষ্টিকর্তায় বি(্বাসীরা এখন কী করবেন?

।। বিজ্ঞান-বিরোধিতার নতুন রূপ।।

সভ্যতার ইতিহাসে বিজ্ঞান যতটা পুরনো, বিজ্ঞান - বিরোধিতাও ততটাই। ঝাড়ফুঁক আর ওষুধ, ধর্মগ্রন্থের গল্প আর জ্যোতির্বিদ্যা - এদের মধ্যে বিরোধ তো থাকবেই। না চাইলেও বিজ্ঞানকে তাই মোকাবেলা করতে হয় ধর্মীয় ও লোকচলতি কুসংস্কারের। পাশ কাটাতে চাইলেও কাটানো যায় না। আর্যভট ও গালিলিও-র কথা সকলেরই জানা। ধর্মীয় শক্তি(সেখানে দাবাতে চেয়েছিল বিজ্ঞানকে - কৌশল করে বা সরাসরি।

আর আধুনিক নয়, এবার 'আধুনিকোত্তর'

হালে কিন্তু বিজ্ঞান - বিরোধিতা দেখা দিয়েছে একক নতুন চেহারায়। আধুনিকোত্তর (পোস্টমর্ডানিস্ট) নামধারী একদল লেখক (মালত দর্শন, সমাজবিজ্ঞান ও 'সাহিত্য ও 'সাহিত্য - তত্ত্ব'র অধ্যাপক) বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও বিজঢানের সত্যকে আত্র(মণ করেছেন বিভিন্ন কায়দায়। তাঁদের বক্ত(ব্য হলো বিজ্ঞান একটি 'পিতৃতান্ত্রিক', সাদা মানুষের ঔপনিবেশিক চত্র(বান্ত। শোষণমূলক সমাজের বৈষম্য ও কর্তত্ব বজায় রাখার জন্যেই নাকি বিজঢানকে এত গু(ত্ব দেওয়া হয়।

এতকাল যেসব ধ্যানধারণা একটু মুখ লুকিয়ে ছিল - বি(্বাসে রোগ সারানো (ফেথ হিলিং), ফলিত জ্যোতিষ, চূড়ান্ত ভাববাদী দর্শন (বি(্বের বস্তুগত অস্তিত্বকেই যা অস্বীকার করে, সবই যার কাছে 'মায়া'), ধর্মীয় মৌলবাদ - এই সুযোগে সব্বাই গোঁফে তা দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। বিজ্ঞান সবকিছুর ব্যাখ্যা করতে পারে না, সব বিজ্ঞানা সব বিষয়ে একমত নন। অতএব বিজঢান ব্যাপারটাই ভুয়ো - এই হলো তাঁদের সিদ্ধান্ত। কিছু বিজ্ঞানী যে পরী(ার নামে কারচুপির আশ্রয় নেন - এতেও তাঁরা বেশ খুশি, কারণ এই দিয়েও গোটা বিজ্ঞানী সমাজকে হেয় করা যায়।

বিজ্ঞান-বিরোধিতা পুরনো আর নতুন

শঙ্করাচার্য যখন পরমাণুবাদ 'খণ্ডন' করেছিলেন তখন তাঁর 'যুক্তি(' ছিল এই বেদ, স্মৃতি ইত্যাদিতে কোথাও পরমাণুর কথা নেই, সুতরাং পরমাণু বলে কিছু থাকতে পারে না।' এমন ছেঁদো কথা শুনে এখন স্কুলের ছেলেমেয়েও হাসবে। কিন্তু ন্যায় - বৈশেষিক দার্শনিকরা (যাঁরা ছিল পরমাণুবাদী) তখন এর যোগ্য জবাব দিতে পারেন নি। সবার ওপরে বেদ-ই সত্য - একথা তাঁরাও স্বীকার করতেন। ফলে, বেদ-এ কোথায় কোন্ শব্দকে পরমাণু অর্থে নেওয়া যায় - এই নিয়েই তাঁদের মাথা ঘামাতে হয়েছিল। পরমাণুর অস্তিত্বের কোনো প্রমাণ তাঁদের হাতে ছিল না। তাই বৃথা তর্কে সময় ও কাগজ - কালি নষ্ট হলো অনেক।

আধুনিকোত্তর বিজ্ঞান - বিরোধীরা শঙ্করাচার্য-র এককাঠি বাড়া। তাঁরা বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। আপে(কতা তত্ত্ব ও কোয়ান্টাম বলবিদ্যা হলো বিশ শতকের বিজ্ঞানের দুটি বড় খুঁটি। এই দুটিকেই বিকৃত করে তাঁরা বলতে চান বিজ্ঞান যখন কোনো নিশ্চিত জ্ঞান দেয় না, তখন ভেলকি, জাদু, ধর্মবিশ্বাস - এই সবকিছুরই তাহলে সমান সত্যতার দাবি আছে।

এও দেখবার যে, ধর্মীয় মৌলবাদীদের মতো আধুনিকোত্তর লোকজন বিজ্ঞানের বিকল্প হিসেবে বিশেষ কোনো ধর্মমতকে বা ধর্মগ্রন্থকে তুলে ধরেন না। তাঁদের ঝোঁকটা হলো সব কিছুকেই গুলিয়ে দেওয়ার দিকে। রাজনৈতিক দিক থেকে এঁদের সবাই দ(ণপন্থী নন, কেউ কেউ বরং নিজেদের প্রতিষ্ঠান - বিরোধী (অ্যান্টি - এস্টাব্লিশমেন্ট) বলে দাবি করেন। বিজ্ঞানও তাঁদের কাছে একটা প্রতিষ্ঠান, তাই তার বি(দ্ধেও তাঁদের লড়াই। লোকের মাথা ঘুরিয়ে দেওয়ার প(তাঁদের কথাবার্তা আপাতদৃষ্টিতে বেশ মো(ম।

এই কাজে তাঁদের একটি বড় সহায় হলো ভাষার প্যাঁচ। তাঁদের ভাবখানা এই একবার পড়লেই আমাদের বক্ত(ব্য বুঝতে পারবে - এমন আশা কোনো না। মজার ব্যাপার হলো, বারকয়েক পড়লেও বিশেষ সুরাহা হবে না, তবে মাথাটা পুরোপুরি ঘুরে যাবে। বাঙলায় এখনও তেমন জোরদার বিজ্ঞান - বিরোধী আধুনিকোত্তর লেখা নজরে পড়ে নি (মুখে কেউ কেউ বলেন, কিন্তু কলম ধরতে বোধহয় ভরসা পান না) তবে সাহিত্য ও সমাজবিজ্ঞানের (ে ত্রে এ ধরণের লেখাপত্র আকছার দেখা যায়। সুতরাং বিজ্ঞানের জগতেও এই কালো ছায়া হয়তো কিছুদিনের মধ্যেই বাঙলাতেও দেখা দেবে। তাই আগে থাকতে সাবধান হওয়া ভালো।

অধ্যাপক সোকাল-এর কাণ্ড!

আধুনিকোত্তর বিজ্ঞান-বিরোধিতা যে কতটা অজ্ঞতার ওপর দাঁড়িয়ে আছে কয়েক মাস আগেই তা ফাঁস করে দিয়েছেন নিউ ইয়র্ক বি(বিদ্যালয়ে এক পদার্থবিজ্ঞানী, অ্যালান ডি. সোকাল (Alan D. Sokal)। আমেরিকার ডিউক বি(বিদ্যালয় থেকে সোশাল টেক্সট্ বলে একটি পত্রিকা বেরয়। আধুনিকোত্তর ভাবধারার একটি এক প্রধান মুখপত্র। ঐ পত্রিকায় ২৮ নভেম্বর ১৯৯৪-এ একটি লেখা পাঠান সোকাল। সম্পাদকমণ্ডলীর সঙ্গে চিঠিতে তাঁর কিছু আলাপ - আলোচনা হয়, তাঁদের পরামর্শ মতো সোকাল তাঁর লেখাটি খানিক 'সংশোধন'ও করেন। শেষে ঐ পত্রিকার এক বিশেষ সংখ্যায় (বসন্ত/গ্রীষ্ম ১৯৯৬) লেখাটি ছাপাও হয়। তার মূল বক্ত(ব্য ছিল বাস্তবতা বলে কিছু নেই।

লেখাটি বেরনোর পরেই, আমেরিকার শি(াজগতের এক পত্রিকায় (লিঙ্গুআ ফ্রাঙ্ক, মে,জুন ১৯৯৬) সোকাল একটি বোমা ফাটালেন। সোশাল টেক্সট্-এ তাঁর লেখাটি, তিনিজানালেন, একটি ব্যঙ্গরচনা (প্যারোডি) মাত্র। ঐ পত্রিকার সম্পাদকরা যেভাবে লেখেন, তাঁদের যেসব গু(র লেখা থেকে উদ্ধৃতি দেয়, সেসব উৎকট শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করেন - সেগুলোই তিনি হাত খুলে কাজে লাহিয়েছেন। আর ঐ পত্রিকার সম্পাদকরা তার কিছুই না বুঝে সেটি যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়ে ছাপিয়েছেন। সোশাল টেক্সট্-এর সম্পাদকরা এতই আত্মবিশ্বাসী যে কোনো বিজ্ঞানীকে দিয়ে লেখাটি যাচাই করিয়ে নেওয়ার কথা তাঁদের মনেই হয় নি। অথচ বিজ্ঞান নিয়ে যেসব মন্তব্য সোকাল-এর লেখায় আছে সেগুলো একেবারেই উদ্ভট। স্নাতক শ্রেণীর কোনো ছাত্র(ও তা ধরতে পারবে।

সোকাল-এর লেখাটির নাম ছিল ''ট্রান্স্গ্রেসিং দ বাউন্ডারিস্ টুআর্ড এ ট্রান্স্ফরমেটিভ হেরমেনেউটিক্স্ অফ্ কোয়ান্টাম গ্রাভিটি''। বাঙলা করলে সেটা ইংরিজির চেয়েও দুর্বোধ্য হবে। তা ছাড়া কে-না জানে আবোল তাবোল -এর অনুবাদ করা যায় না। সোকাল -এর লেখা থেকে একটি অংশ তুলে দেওয়া যাক

> ...The r of Euclid a the G of Newton, formerly thought to be constant and universal, are now perceived in their ineluctable historictiy; and the putative absorver becomes fatally de-centered, disconnected from any epistemic link to a space - time point that can no loger be defined by geometry alone.

এর সারকথা জ্যামিতির ধ্রুবক (যেমন, বৃত্তের পরিধি-ব্যাসার্ধ অনুপাত) ও মহাকর্ষ ধ্রুবক $G=\frac{FD^2}{M_1M_2}$ ধ্রুবক নয়, মানুষেরই গড়া এখন তাকে ঐতিহাসিক পটভূমিতে দেখা হচ্ছে। শুধু জ্যামিতি দিয়ে সেটি নির্ধারণ করা যায় না। - বিজ্ঞানের সঙ্গে সামাজিক-আর্থনীতিক ইতিহাসের সম্পক আছে - একথা কেউই অস্বীকার করবেন না। কিন্তু তার জন্যে 'পাই' বা 'জ' আর ধ্রুবক থাকবে না - এ একেবারেই হ য ব র ল। সোকাল অবশ্য দুঃখ করে বলেছেন, অর্থহীন কিন্তু ব্যাকরণগতভাবে শুদ্ধ বাক্য লেখার ব্যাপারে তাঁর তেমন (মতা নেই। - সে-(মতা দেখিয়েছেন আধুনিকোত্তর দর্শন-গু(, জাক দেরিদা। আইনস্টাইন ও আপে(কতা প্রসঙ্গে তিনি যা লিখেছিলেন এখানে তারই ব্যঙ্গরূপ দিয়েছেন সোকাল।

ইগ্নোবেল পু(স্কার, ১৯৯৬

আমেরিকার একটি পত্রিকা, অ্যানাল্স্ অফ ইমপ্রোব্লি রিসার্চ -এই উদ্যোগে প্রতি বছর 'ইগ্নোবেল (IgNobel)' পুরস্কার দওয়া হয়। নামেই বোঝা যায় এটি নোবেল পু(স্কারের 'অনুকরণ' (ইংরিজিতে 'Ignoble' কথাটার মানে 'অসম্মানজনক'। এখানে তাই এক ধরনের (ে-য অলঙ্কার হয়, দু-অর্থেই শব্দটি নেওয়া যেতে পারে)। ১৯৯৬-এ ইগ্নোবেল শান্তি পুরস্কার দেওয়া হয়েছে ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি জাক শিরাক- কে, হিরোসিমা - নাগাসাকি-র ৫০-তম বছরে যিনি প্রশান্ত মহাসাগরে আটটি পরী(ামূলক নিউক্লিয় বিস্ফোরণ ঘটিয়েছেন। আর, সাহিত্যে ইগ্নোবেল পুরস্কার পেয়েছে সোশাল টেক্সট্ পত্রিকা। সোকাল-রে লেখাটি ছেপে তার সম্পাদকরা সত্যিই অসাধারণ সাহিত্যবোধের পরিচয় দিয়েছেন। বলা বাহুল্য, শিরাক বা সোশাল টেক্সট্ -এর কোনো প্রতিনিধি ঐ পুরস্কার নিতে যান নি।

বিজ্ঞানের অপব্যবহার দায়ী কে?

বিজ্ঞানের যে বহু অপব্যবহার হয় - এ তো নতুন কথা নয়। কিন্তু তার জন্যে দায়ী কে? যে শ্রেণী বা রাষ্ট্রশক্তি(বিজ্ঞানকে মারণাস্ত্রের উদ্ভাবক করে তোলে, অবশ্যই তারা। অথচ আধুনিকোত্তর বিজ্ঞান - বিরোধীরা এই সহজ কথাটি ভুলে যান, বা ইচ্ছে করেই মনে রাখেন না। তাঁরা আত্র(মণ করেন বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিকে, মানুষের গোটা যুক্তি(- বুদ্ধিকে। সব বিজ্ঞানীই কি দুর্নীতির জীবাণুমুক্ত(? নিশ্চয়ই তা নয়। কিন্তু ১৯৮০ থেকে ১৯৮৭ - র মধ্যে মাত্র ছাব্বিশটি (ে ত্রে মার্কিন বিজ্ঞানীদের দুরাচারের প্রমাণ পাওয়া গেছে। মোট যত বিজ্ঞানী গবেষণা - অনুদান পেয়ে থাকেন, এ হলো তাঁদের শতকরা এক ভাগের তিরিশ হাজার ভাগের একভাগ। তার মধ্যেও একুশটি ঘটনা ছিল চিকিৎসা ও জীববিজ্ঞানীদের (ে ত্রে। অথচ এর জন্যে কাঠগড়ায় তোলা হচ্ছে গোটা বিজ্ঞানী সমাজকে।

প্রতিরোধের ডাক

ইওরোপে ১৮ শতকে চিন্তার মুক্তি(র (ে ত্রে এক নতুন দিক খুলে যায়। ইতিহাসে তার নাম দীপায়ন (দ এনলাইটেনমেন্ট)। দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, সাহিত্য - সব (ে ত্রেই নতুন হাওয়া বইতে শু(করে। তার মূল ল(ণই ছিল যুক্তি(তে আস্থা, প্রমাণে আস্থা, ধর্মগ্রন্থ বা কোনো আপ্তবাক্যে বিনা প্রশ্নে বি(শ্বাস না - করা। নিজের বিচারবুদ্ধির ওপর ভরসা রেখে, সাহস করে এগিয়ে চলাই তার ল(্য। আজ, বিশ শতকের শেষে এসে ধর্মীয় প্রতিক্রি(য়াশীলদের সঙ্গে তারই বি(দ্ধে হাত মিলিয়েছেন আধুনিকোত্তর

কিছু 'ভাবুক'। দীপায়ন-এর পরে থেকে সমাজ-বদলের যে-ভাবনা ও পরিকল্পনা দেখা দিতে থাকে - এঁদের লড়াই তারই বি(দ্ধে। আফগানিস্তান - এর তালিবানওয়ালাদের সঙ্গে এ ব্যাপারে তাঁদের তফাত করা শক্ত(।

সুখের বিষয়, বিজ্ঞানী - চিকিৎসক -দার্শনিক -শি(করাও বিজ্ঞান ও যুক্তি(সপ(এককাট্টা হচ্ছেন। ১৯৯৫-এ নিউ ইয়র্ক বিজ্ঞান আকাদেমির এক সভায় তিনদিন ধরে দুশ' প্রতিনিধি এই নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁরা মনে করেন, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির বি(দ্ধে আধুনিকোত্তর আত্র(মণ গণতন্ত্র-র ভিত্তিতেও ঘুণ ধরিয়ে দেবে।। নোবেল পুররস্কার পাওয়া কিছু বিজ্ঞানীও এই প্রতিবাদের দলে আছে। এঁরা সকলেই মনে করেন পাল্টা আঘাত না করলে বিজ্ঞানের তথা মানুষের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। নিউ ইয়র্ক-এর জীব রসায়নবিদ ড. সল গ্রীন যেমন বলেছেন

> সময় হয়েছে হাত নোংরা করার - হাতুড়েপনার বি(দ্ধে জেহাদ শু(করাত।
> (It's time to get nasty - to launch a crusade against quackery.)

টীকা

1. T. Jayaraman, The Sokal affair. Frontline, October 4, 1996.
2. Philip J. Hilts, 'tumbling toast corners tohe honours at the IgNobels', New York Times News serivce, the Telegraph, October 6, 1996.
3. Malcolm. W Browne, 'Shall science yield to magic again?', New York Times. Reprinted in The Telegraph. Hune 19, 1995.

উৎস মানুষ জানুয়ারি ১৯৯৭